# খোসলা কা ঘোসলা

## মৈত্রেয়ী কুমার

Online version: http://wp.me/p7iuFD-41

সিটি সেণ্টারের বাস ধরবো বলে হা পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি। ট্র্যাফিকের চাপ থাকে সকালটায়। বাসও দেরী করে মাঝে মধ্যে। তারপর দেখা যায় একসাথে পরপর তিনটে এসে হাজির। বেশ ভিড়, তবু তারই মধ্যে কোনোক্রমে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেলাম। দেখি সামনের সীটে জালনার ধারে, আরে! প্রীতম খোসলা না! সদ্য মুম্বই থেকে এসেছে। আমার কর্তার কোলীগ। আলাপ হয়েছিল এশীয়ান স্টোরে। আমি যখন মহানন্দে দেশ থেকে সেলিব্রিটি — কচি পটল, লাল শাক, গোল লাউ আর চালতাদের আপ্যায়ণে ব্যস্ত, ভদ্রলোক খুব দুঃখিত সুরে বলছিলেন, 'এক মাস ধরে একটা টেম্পোরারি বাসা বাড়িতে আছি। মেয়ের স্কুলটা দূরে হয়ে গেল। মনের মতন একটা বাড়ি পাচ্ছি না। বাড়ি মনে ধরে তো দরে পোষায় না। দরে পোষালে বাড়ি অসহ্য। কি জ্বালা মশায়! গিন্নীর মুখে হাসি নেই আজ এক মাস।'

- 'ডীলার ধরেছেন তো?' কর্তা শুধোয়।
- 'ডীলারগুলো ওয়ার্থলেস!'

খোসলার তুম্বোমুখ দেখে মনে হচ্ছে না সুখবর। তবু ভিড় পাতলা হতে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বললাম, 'হ্যালো!' চমকে মুখ ফেরালেন, 'হ্যালো জী হ্যালো।' জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাইসাব, ঘর —' আমার কথা কেটে তিনি বলে উঠলেন, 'ক্যা মন মেরে, ঘর ঘর মত কর/ দো দিন কা সনসার, কাঁহা সোচ তেরে।'

বুঝলাম কেস জণ্ডিস! মনে পড়ে গেল এই শহরে বাড়ি খোঁজা নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার দিনগুলো। খোসলার মুখের হাসি যে কেন লুপ্ত সরস্বতী তা পাঠক বুঝতে পারবেন আমার সেই দিনগুলোর পঞ্জিকায় চোখ বোলালে। খোসলাকে হওসলা দিয়ে বাস থেকে নেমে গেলাম।

১৯শে মার্চ

আমার গোটা সংসারটা চল্লিশখানা প্যাকিং বাক্সে পুরে এসে গেলাম কোপেনহেগেনে। আপাততঃ জিনিসপত্র ওয়েরহাউসে থাকবে। হোটেলে উঠেছি। ইস্টারের ছুটি চলছে। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে একটা বাসা ভাড়া পেতেই হবে। তারপর শুরু হবে মেয়ের স্কুল, কর্তার অফিস। তার আগে থিতু হওয়া দরকার। রোজ রাত্তিরে নিয়ম করে শুরু করেছি বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনে ঢ্যাঁড়া মারা, ডীলারের ফোন নাম্বার টোকা, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেওয়া। মনে আশার বুদবুদ ফুটছে, ভালো কিছু হবেই। আহা, সবুজ ঘাসের একফালি বাগান, তাতে একখানা চেরী গাছ। আঃ, ফাটিয়ে সংসার করবো। আমাকে আর পায় কে!

২০শে মার্চ

সকাল দশটার কিছু আগেই আমরা ডীলারের বাতলে দেওয়া নিদৃষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। মনে প্রবল উত্তেজনা। আজ সমুদ্রের ধারে একখানা বাড়ি দেখার আছে। আহা, সাগরের উতল হাওয়ায় সংসার পাতব ভেবেই আমার 'কোপেনহেগেনে কাঁপুনি' হতে লাগল। সামনেই গাঢ় নীল জলের বাল্টিক সাগর। দু চারটে সেইলবোট ভাসছে। বন্দরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মালবাহী জাহাজ। ইতিমধ্যে যতগুলো মেয়ে পুরুষ তড়বড়িয়ে হেঁটে আসছে সবকটাকেই মনে হচ্ছে ডীলার। দেখি একটা মেয়ে হন্‌হনিয়ে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তার পাশে অল্প উঁচু পাঁচিলে একটা ঠ্যাঙ তুলে জুতোর ফিতে বাঁধছে। এই-ই হবে। তিন-তিনটে বাড়ি দেখাবে কি না, ঢিলে জুতো বেঁধে টাইট করে নিচ্ছে। তিন জোড়া চোখ উদ্‌গ্রীব তাকে জরীপ করছে দেখে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যা বাব্বাঃ।

এ দেশে আসার আগে শুনেছিলাম, বাই নেচার ডেনিশরা খুব ফ্রেণ্ডলি হয়। পথ চলতি অচেনা মানুষের মুচকি হাসি বেশ অনেকবারই কুড়োলাম। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতন যত্নে মনের মণিকোঠায় তুলে রাখলাম। অজানা অচেনা মানুষ, মানুষকে দেখে দুর্মূল্য হাসি বিলোচ্ছে, এ তো ভাবা যায় না! কিন্তু সে যেন হল। এদিকে দশটা তো বেজে গেল! ডেনিশদের সময়জ্ঞান তো শুনেছি পাক্কা!

হঠাৎ একটা গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ালো । দরজা খুলে গাড়ি থেকে না নেমে উটের মতো গলা বাড়িয়ে এক মহিলা বললে, 'হাই।' বুঝলাম ইনিই ডীলার । (ডেনিশরা দেখা হলে ছোট্ট করে বলে 'হাই' আর বিদায় নিতে বলে 'হাই-হাই'।) মহিলা পাঁচ মিনিট দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়ে ভগ্নদূতের মতন অশুভ সংবাদটি দিলেন। 'আসলে বেরোবার মুখেই খবর পেলাম সী-ফেসিং বাড়িটা উঠে গেছে।' শুনেই মেজাজটা অ্যায়সা খিঁচড়ে গেল যে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'তা আমরাই বা এখানে পড়ে আছি কেন?' সে বললে, 'তোমরা আমার গাড়িতে উঠে আসতে পারো। এখান থেকে মিনিট দশেকের ড্রাইভে একটা দু কামরার ফ্ল্যাট দেখাতে পারি। এরিয়া পশ, ট্রান্সপোর্ট সুপার, দোকান-বাজার সব হাতের কাছে।'

দু চোখে সমুদ্র হারিয়ে আমার তখন চোপসানো বেলুনের দশা। মুখে কথাটি না কয়ে গাড়িতে উঠে সবে দরজাটা বন্ধ করেছি কি করিনি, ডীলার হাঁকলে, 'ইজি উইথ্ দ্য ডোর!' আরে, গোমড়া মনে আছি বলে কি ও ভাবছে গাড়ির দরজায় সব রাগ ক্যাথারসিস করছি? যত্ত সব!

'হিয়র উই আর!' ডীলারের স্বরে চটকা ভাঙে। বিল্ডিংটা বেশ নতুন। পুরনো ধাঁচের লাল ইঁটের জেলখানা মার্কা টিপিক্যাল ডেনিশ বাড়িগুলোর মতন নয়। দু কামরার ফ্ল্যাট। জায়গা মন্দ নয়। চিলতে খানিক বারান্দাও আছে। সেখান থেকে 'টুকুন সমুদ্রের ঝুঁটিও দেখা যাচ্ছে। মনটা নতুন করে খারাপ হল। যাই হোক, কিচেন বাথরুম ভদ্রগোছের, কিন্তু স্টোরেজের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ সব দেশে সাধারণতঃ বেসমেণ্টে বাড়তি জিনিষপত্র রাখার আলাদা গুদোম ঘর থাকে। ডীলার বললে, 'এই দামের ফ্ল্যাটগুলোতে সে সুবিধে নেই।' আমাদের তো আর লোটাকম্বলের জীবন নয়! আবার বেরোবার মুখে দেখি, দরজার পাশে গণেশ-সরস্বতীর পট ঝুলছে ।

আনমনে মা সরস্বতী আর সিদ্ধিদাতাকে আঁখি ঠারি। এ ফ্ল্যাটের মালিক যে হিন্দু মাইথোলজির ভক্ত তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বাইরের দেশে গনেশ, শিব আর কৃষ্ণ বেশ মুরুব্বী পাওয়া দেবতা এ আমি জানি। কিন্তু এসব দেখে তো আর মনের চিঁড়ে ভেজে না! গিয়ে উঠলাম আবার ডীলারের গাড়িতে। রোদ সরে গিয়ে আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। সমুদ্রের জলেও অশান্তি। হঠাৎ চোখ চলে গেল একসার মনমরা হলুদরঙা বাড়ির পাড়ায়। 'এই পুরনো বাড়িগুলো কাদের?' জিজ্ঞেস করলাম ডীলারকে। সে বললে, 'ওটা পুরনো জেলেপাড়া। ডেনিশরা ইতিহাস ভলোবাসে বলে আজও ওসব বাড়ি মেইনটেন হয়। লোকে থাকেও।' এই বলে চোখ মটকে হেসে বললে, 'দেখব না কি ওখানে?'

দ্বিতীয় বাড়ি যা দেখলাম তার চেয়ে বোধহয় ওই ডেনিশ জেলেদের পোড়ো বাড়িও ছিল ভালো। ওটা বাথরুম? না, চুহাদের চানঘর! শরীরটা একমাত্র বায়বীয় গোছের হলেই ওই বাথরুমে ঢোকা এবং নড়াচড়া করা সম্ভব। আমার মতন সলিড গোত্রের ওখানে নো এণ্ট্রি!

ডীলার আমাদের মনমরা অবস্থায় যেখান থেকে তুলেছিল, সেই ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ানেই নামিয়ে দিল।

<u>২৫শে মার্চ</u>

গত দুদিনে বারোখানা বাড়ি দেখেছি। অথচ আজও 'হাতে রইল পেন্সিল' অবস্থা। আজও কিছু বাড়ি দেখার প্ল্যান আছে। সকাল থেকে আবহাওয়ার গতিক খারাপ, অথচ বসন্তকাল! তবে ডেনমার্কের আবহাওয়া যা বুঝছি গেরস্ত গিন্নীদের মুডের মতন। তিনবেলা তিনরকম, নাগাল পাওয়া ভার।

আজ আমরা প্রথম বাড়িটা ডীলার ছাড়াই দেখবো। এদেশে ডীলারদের সাহায্যে বাড়ি পাওয়াটাই দস্তুর হলেও কখনো কখনো বাড়িওয়ালারা লাভের গুড় বাঁটতে রাজি না হওয়ায় নিজেরাই বাড়ি ভাড়া বা বিক্রির ধান্ধা করে। এমনই এক বাড়িওয়ালার খবর পেয়ে হাজির হয়েছি। পুরনো পাড়ার পুরনো বাড়ি। এ শহরের বেশীর ভাগ পুরনো বাড়িতেই আবার

লিফ্‌ট নেই। হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠলাম চারতলার ফ্ল্যাটে।  হাঁপিয়ে বেল বাজাতেই দরজা খুলে দাঁড়ালো এক নাদুস নুদুস ডেনিশ বুড়ো। ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো, ‘ঘর দেখবে?’

(সমুদ্রের খাঁড়িপথে চলছে ট্যুরিস্ট বোঝাই ওয়াটার ট্যাক্সি। ছবিঃ কান্তি কুমার)

দেখলাম। ঘর, না অ্যান্টিক শপ! দেওয়ালে দাদামশাই ঘড়ি, শো কেসে রুপোর কাঁটা চামচ, গ্রামোফোনের চোঙা, ভিক্টোরিয়ান আসবাব, মান্ধাতা আমলের জলের পাইপ, চেন টানা কমোড! আদ্দিকালের বদ্যিবুড়ো বললে, ‘শোনো, আমার বাপু সমুদ্রের মাঝে দ্বীপে একটা সামার হাউস আছে। সারা জীবন ডাঙ্গাঁয় থেকে থেকে বোর হলুম। এবার ভাবছি বৌকে নিয়ে দ্বীপান্তরবাসী হব। কিন্তু যদি সে জীবন না পোষায় তো আবার ফিরে আসবো ডাঙ্গাঁয়। তাই আমার জিনিসপত্র কিছু সরাবো না!’

প্রমাদ গুনে বললাম, ‘আমার জিনিসগুলো যে সব ওয়েরহাউসে পড়ে আছে, তার কি গতি হবে তাহলে?’ বুড়ো অবুঝ মাথা নাড়ে। ‘আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভেজাবো না।’ অগত্যা কি আর করা! বুড়োকে তার উভয়চারী ব্যাঙ জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পথে নামলাম।

দিনের শুরুতেই গোঁত্তা খেলাম, আজ আর ভালো কিছু হয়েছে! মনের রাগ রাস্তার পাশে এক ক্যাফেটেরিয়াতে বসে এক কাপ গরম কফির চুমুকে ঠাণ্ডা করতে চাইলাম। কর্তা আমার মনের হাল বুঝে সন্তর্পণে বললে, ‘এ হল আমাদের সেই দিল্লীর বুড়ো বাড়িওয়ালার মতন, বুঝলে!’ তা আর বুঝবো না? এদের বেয়াড়া আবদারগুলো কতকটা ‘ছুটলে কথা থামায় কে? আজকে আমায় ঠেকায় কে?’ জাতীয়।

দিল্লীর এক অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের ভাড়াটে হয়ে নাকানি চোবানি যা খেয়েছিলাম তা আর কি বলব! আলো, হাওয়া, জল সব কিছুরই সাপ্লাই থাকতো বুড়োর বজ্রমুষ্টিতে। তার উপর নিদ্রাহীনতার রুগী। বাড়িওয়ালা ঘুমুবে না, আর ভাড়াটে ডাকবে নাক! তা কি হয়? অতএব নিদান এলো ভোর চারটের সময় উঠে জল ভরে নিতে হবে ট্যাঙ্কিতে। সারাদিনে আর জল দেওয়া যাবে না। দু-ঘর ভাড়াটে আমরা ভোর চারটেয় ঢুলতে ঢুলতে ট্যাঙ্ক ভরে নিতাম। এছাড়া

বালতি, গামলা, হাঁড়ি, ডেকচি সব ভরে নিতাম। ছোট বাচ্চা নিয়ে সংসার। ধোয়া মোছায় জল তো লাগেই। অভিযোগ করলে উধোর পিণ্ডিটি পরম যত্নে বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বুড়ো বলতো, 'সরকার কো যা কে বোলো। হাম ক্যা চীজ হ্যায়!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে মনে মনে বলতাম, 'তু চীজ বড়া হ্যায় মস্ত মস্ত!'

যখন তখন ভাড়াটেদের ঘরে ঢুকে খানাতল্লাশী চালাতো বুড়ো। সেদিনই হয়তো আমাদের তিনজনের ভিকো বজ্রদন্তী মার্কা একখানা ছবি টাঙিয়েছি দেওয়ালে। হাতে নাতে ধরা পড়ে যেতাম। — 'ইয়ে তসবীর তো পহলে নেহী থা!' হাত কচলে বলতাম,'নো আঙ্কল, আভী আভী লটকায়া।' চোখ মুখ কুঁচকে বুড়ো বলতো, 'কিউঁ? কিউঁ করতে হো ইয়ে সব?' তারপর নিজের বুকে ক্রমান্বয়ে খোঁচা মেরে বলতো, 'সমঝো কি ইয়ে ছেদ ইধর হুয়া, ইধর!'

<u>২৬শে মার্চ</u>

ইংরিজিটা ডেনগুলো বেশ তরতরিয়ে বলে, তাই বাঁচোয়া। যা কঠিন ভাষা! 'পঙ্গুঁরেরে লজ্জাও গিরি' বলা বরং অনেক আরামের। বিদেশিদের মুখে অশুদ্ধ ডেনিশ এরা কানে সইতে পারে না। তাই জার্মান বা ফ্রেঞ্চদের মতো ইংরিজি বলা নিয়ে এদের কোন ছুঁৎমার্গও নেই। আমরা ওদের ভাষা মুখে পুরে দাঁত আর জিভের লড়াই শুরু করলেই এরা ব্যাপার বুঝে টুক্ করে ইংরিজি বলতে শুরু করে।

গল্প হচ্ছিল ডীলারের গাড়িতে বসে। আজকাল এদের সাথেই ওঠা বসা, গাল গল্প। সেদিনকার ওই জেলেপাড়া আমাকে খুব টানছিল। কথায় কথায় জেকব, আজকের ডীলার, শোনাল সেই গল্প গাথা।

'আজকের কথা নয়, সে প্রায় ১৭০০ সাল। সামনেই ন্যু হাভন বন্দর দেখেছ তো? ওখান থেকেই বাড়ির পুরুষরা সন্ধ্যাবলায় বেরিয়ে যেত বাল্টিকের বুকে। মাছ ধরে ফিরতে ফিরতে দু-তিন দিন। তখন প্রায়ই বিরহিনী জেলে বৌ-দের একাকী রাত কাটানোর দুঃখ দূর করতে মাঝে মধ্যে নাবিকরা আসতো। যে বাড়ির দরজায় সাদা ফুলেল গাউন পরা বিরহিনী জেলে বৌ উদাস ভঙ্গীতে বসে থাকতো, সেই বাড়িতেই নাবিকরা তাদের মনোরঞ্জনে তৎপর হত। ডাঙ্গাঁর মজা লুটে ফিরে যেত কাকভোরে জাহাজঘাটায়।'

(কোপেনহেগেনের ঐতিহ্যপূর্ণ জেলেপাড়া। ছবিঃ কান্তি কুমার)

জেকব বললে, 'আমাদের দেশটা তো কতগুলো খুচরো দ্বীপ নিয়ে। আর কোপেনহেগেনকে তুমি ক্যানালের শহরও বলতে পারো। দেখেছ তো, অজস্র ক্যানাল শহরের বুক চিরে সমুদ্রে মিশেছে।' বললাম, 'আলাদা করে শহর দেখার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। এই বাড়ি দেখার জন্য ঘুরতে ঘুরতে যা দেখা। একটা ভালো বাড়ি জুটিয়ে দাও তো, মনের আনন্দে তোমাদের শহর দেখি!' জেকব কিছু না বলে হাসলো। চলতে চলতে দেখলাম, ক্যানালগুলোতে ওয়াটার ট্যাক্সি চলেছে। তাতে ট্যুরিস্টের দল। সিটি সেণ্টারের জমজমে ব্যস্ততা। কিন্তু অকারণ কান ফাটানো হর্ণের আওয়াজ নেই। বিশাল ক্যাথিড্রালের চূড়াগুলো সবুজ রং আর মাথাটা মসজিদের মতো গোল। স্থাপত্যে রাশিয়ান শৈলীর ছাপ।

'ডেনিশ স্থাপত্য আর ফার্নিচার ডিজাইন পুরো দুনিয়াতে খুব নাম কিনেছে, বুঝলে?' আমাকে হাঁ করে শহর গিলতে দেখে কর্তার মন্তব্য। এদের স্থাপত্যে একটা ভারি ছিমছাম স্মার্টনেস আছে যা মনকে খুব সরল আনন্দ দেয়। আড়ম্বরহীন সুন্দর আয়োজনের মতন। চোখ ধাঁধানো আকর্ষক আর্কিটেকচার আর পুরাতনী স্থাপত্যের এক অপূর্ব সহাবস্থান চোখে পড়ে। নতুন আর পুরাতনের এই মেলবন্ধন শহরটাকে নান্দনিক সৌন্দর্য্য দিয়েছে।

২৭শে মার্চ

'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' আমাদের মেয়ের অবস্থা কতকটা এমনই দাঁড়িয়েছে। নতুন শহরে, হোটেলের ঘরে সারাদিনের জন্য একটা ছোট মেয়েকে ছেড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বেচারি টিভির কার্টুন দেখতে দেখতে আধখানা কাপ কেক-এ সবে কামড় দিয়েছে, বললাম, 'ওরে, তৈরী হ'। মিশন মকান ডেকেছে দুপুরে।' ওর ছোট্ট ব্যাগপ্যাকটা গোছানোই থাকে। বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

কর্তার অফিসে জরুরী মিটিং ছিল। বাড়ি দেখার দায় বড় দায়। ঘণ্টাখানেকের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এনেছে। আমি মেয়ে নিয়ে সোজা গেলাম নিদৃষ্ট ঠিকানায়। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, হাওয়ায় স্যাঁতানো পাঁপড়ভাজার মতন দাঁড়িয়ে আছি। ডীলারের পাত্তা নেই। কর্তার বাড়তি টেনশান। নতুন কাজের জায়গা। সময় মতন ফিরতে হবে। গত সাতদিনে না হোক বিশটা বাড়ি দেখে ফেলেছি। সকাল দুপুর বিকেল নানা এলাকায় হেঁটে হেঁটে পায়ের পাতা টাটিয়ে গেছে। কোমর ব্যথায় কাতরায় রাত্রে শুলে। বুক ঢিব ঢিব করে এখনো কোন সুরাহা হল না বলে। ঘুমের ঘোরে বিচিত্র আকৃতির কিচেন সিঙ্ক, টয়লেটের কমোড, সোফা চেয়ার ডাইনিং টেবিল দাঁত কপাটি মেলে অট্টহাস্য করে — 'আমাকে নিবি! আমাকে নিবি না?' মনে হয় কি যেন এক সাঙ্ঘাতিক বাড়ি দেখার রোলার কোস্টারে চেপে বসেছি। 'আর বাড়ি দেখব না, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও!' বলে চীৎকার করছি। অথচ নিস্তার নেই।

আনমনে মন চলে কোন পথে। 'এ ব্যাটা ডেনিশই নয় মনে হয়! টাইমের কোনো মা-বাপ নেই?' কর্তার গজরানিতে খেয়াল হয়, সত্যি তো! সব ইউরোপীয়ানরা কম বেশী সময়ানুবর্তী হলেও জার্মানরা পনেরো মিনিটের লেট লতিফদের ক্ষমা করে নেয়। সুইসরা আবার নিদৃষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই পোঁছে যাওয়াকে ভালো চোখে দেখে না, বরং পাঁচ মিনিট দেরী হোক, সেও ভালো। এখানকার বাতাসে কথা ওড়ে যে, ডেনরা কিন্তু অসম্ভব পাংচুয়াল। সাতটাকে সাতটা, আর দশটাকে দশটা মেনেই চলে। এসব দেশে পার্টি করলে পার্টির সময়টুকু পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে গেস্টদের বলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেমন সন্ধ্যে ছ'টা থেকে মাঝরাত্তির বা সন্ধ্যে সাতটা থেকে এগারোটা, এইরকম আর কি!

ডেনিশ গেস্টরা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টাতেই হোস্টের দরজায় বেল দেবে। মনে হয় এরা যেন হোস্টের বাড়ির আশেপাশে বাগানের ঝোপে ঝাড়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সময়টি হল কি ওয়াইনের বোতল বগলে পোঁছে গেল দরজায়। আবার হাজার আড্ডার মাঝে থাক, হোস্ট যেহেতু পার্টি খতমের সময় রেখেছে রাত বারোটা, গেস্ট ডেন্ তড়াক্ করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হোস্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'হাই-হাই' করে বেরিয়ে গেল। অবশ্য এসব দেশে রাত দশটা পর্য্যন্ত তুমি ছাড়া গরু। তারপর হুল্লোড় পার্টি চালাতে হলে হোস্টদের প্রতিবেশীদের আগাম জানিয়ে অনুমতি নিতে হয়, তা না হলে দোর গোড়ায় পুলিশ দারোগা এসে হাজির হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। বিরক্ত প্রতিবেশীদের একটা ফোন কল যথেষ্ট।

এ হেন ভদ্র সমাজে এই ডীলারটা কোন সৃষ্টিছাড়া! লঝ্‌ঝরে বাঁকা কৃষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি তিনজন। ক্লান্ত। নীরব। হঠাৎ কোত্থেকে ভূতের মতন উদয় হল বাড়তে বাড়তে শেষে যথেষ্ট হয়েছে আর নয় গোছের এক লম্বু। ডেনিশরা মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে লম্বাও হতে পারে বটে! এদের ভিড়ে নিজেকে আমার মনে হয় বাঁশবাগানে শেয়ালকাঁটার ঝোপ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তাই বলে এতটা! আমাদের তিনজনের ঠাণ্ডা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে তিন বারে সে উচ্চারণ করল, 'রাসমুস, রাসমুস, রাসমুস্।' তার এই তিন নামোচ্চারণ মন্ত্রে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। উত্তরে কি বলব ভাবছি, হঠাৎ খ্বিক খ্বিক হাসির শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি চাপা হাসির গমকে মেয়ে লাল।'ও কি বলল মা? অ্যাটমস, অ্যাটমস, অ্যাটমস? ওর ফার্স্ট নেম যদি অ্যাটমস হয়, তাহলে লাস্ট নেম কি ফিয়ার? হি হি হি হি।'

ধমকে বলি, 'অ্যাই চুপ! বাড়ি পছন্দ হয় কি নেই ঠিক, শুধু হি হি হি হি।' বেচারা হাসি গিলে নেয়। জীবনের ছোট বড় হাসি আনন্দ, মজা মস্করা সব যেন এসে শেষ হয়েছে শুধু মিশন মকানের সার্থকতায়।

'হাই' পর্ব মিটিয়ে সিঁড়ি ভেঙে অর্ধেক ফ্লোর উঠে, তারপর লিফ্ট। পুরনো বাড়ি, পরে লিফট্ বসানো হয়েছে। ভাইকিং-এর জাত তো। বাচ্চা বুড়ো সব হাট্টা গাট্টা। ছ'-সাত তলা বাঁই বাঁই করে সিড়ি ভেঙে ওঠা এদের কাছে জলভাত। এক আশি বছরের বুড়ো তার সাইকেলখানা ঘাড়ে করে আমাদের আগে সিড়ি ভেঙে উঠে গেল। লাজ লজ্জার পাট কবেই তুলে দিয়েছি। ক্লান্তি এসে সব চেতনা গ্রাস করে বসেছে। এই কি জীবন! শুধু বাড়ি দেখে দেখেই ফৌত হয়ে যাব?

সেই আজব ডেনিশ কনসেপ্ট! গড়ের মাঠের মতন বিশাল গড়ানে ড্রইং, ডাইনিং। সাথে লাগোয়া ওপেন কিচেন। বাঁ দিকের লম্বা প্যাসেজ ধরে পরপর তিনটে ঘর। অবশ্য এগুলোকে ঘর না বলে চুহা কন্দর বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মনে পড়ল জেকব এমনই এক মার্কামারা বাড়ি দেখাতে এনে বলেছিল, 'ডেনরা ভাবে মানুষের জীবনের অর্দ্ধেক সময় কেটে যায় বাড়ির বাইরে। আর বাকিটুকু গদাই লস্করি চালে কাটে ড্রইংরুমে টিভির সামনে আর ডাইনিং-এর টেবিলে। বেডরুম মানেই সারাদিনের ক্লান্ত শরীরটাকে কোনমতে বিছানায় ফেলে দাও। রাতটুকু কাবার করে সকাল হলেই আবার লাফ দিয়ে চলে এসো আলোয় ভরা খোলামেলা ড্রইংরুমে। তাইতো ডেনদের প্রিয় দেওয়াল রং সাদা। আর দরজা জালনাগুলো কাঁচের। যাতে সূর্য্যের সাতরঙা ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটতে পারে ডেনদের ড্রইং ডাইনিং এরিয়ায়।'

আমি বলেছিলাম, 'আমাদের ভারতীয়দের কাছে কিন্তু বেডরুম মানেই সকল রুমের সেরা। সে রুম স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হবে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।'

এই চুহা কন্দরে তো জীবন চিঁ-চিঁ করেই দফারফা হবে। অতএব 'পথে এবার নামো সাথী, পথেই হবে পথ চেনা।'

রাসমুস আরো একটা বাড়ি দেখাবে। তার গাড়িটা ছোট বলে সে আমাদের পরামর্শ দিল ট্যাক্সি ধরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছতে। মিনিট পাঁচেকের দূরত্ব। সে আসছে গাড়িতে। কর্তা সতর্ক করে দিল তাকে। 'দেরী কোরো না। আমাকে অফিসে ফিরতে হবে।'

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমরা বলা কওয়া করছিলাম, স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ার দেশগুলোতে বেশীর ভাগ সময়েই তো বৃষ্টি আর মেঘলা। সূর্য্য যেদিন উঠল তো ব্যস! সাজো সাজো রব পড়ে যায় চারিদিকে। দলে দলে বাচ্চা বুড়ো নারী পুরুষ মুখিয়ে ওঠে বিনা কাজের ব্যস্ততায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। কিছু না হোক, কবল্ স্টোন বসানো পিয়াৎজার ফোঁয়ারা বাঁধানো চত্বরে, পার্কে, ক্যাফের বাইরে পাতা টেবিল-চেয়ারে হ্যাট, সানগ্লাস পরে, বীয়ারের ঠাণ্ডা ক্যান হাতে নিয়ে সূর্য্যের মুখপানে চেয়ে বসে থাকে। দেহের প্রতিটা অণু পরমাণুতে শুষে নিতে চায় সৌরকণার উত্তাপ। ধীরে ধীরে সৌরতাপে রক্তিম হয়ে ওঠে এদের দেহ। যারা দোকানে বা অফিসে বা কাজের জায়গায় ঘরের ভেতরে থাকতে বাধ্য হয়, ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় হা হুতাশ করে সূর্য্যের আলোয় স্নান করা ভাগ্যবানদের দেখে। যার শরীর যত বেশী সৌরতাপে ভাজা পোড়া হবে, মহল্লায় সে তত বেশী ঈর্ষার পাত্র হবে।

এই সৌরতাপ ঘরের ভিতরেও যাতে অকৃপণ ভাবে আসে, তাই ড্রইংরুমের দেওয়ালগুলো বেশীর ভাগ হয় শার্সির। পরদাবিহীন। শোবার ঘরগুলো এরা একটু ঘুপচি মতনই পছন্দ করে। কারণ গরমের দিনে পৃথিবীর নর্থ পোলের কাছাকাছি এই দেশগুলোতে রাত বারোটার আগে সূর্য্য ডোবে না। নরওয়েতে তো রাত বলেই কিছু নেই। অনন্ত দিন,

অনন্ত আলো। ঘর অন্ধকার করার জন্য এরা চোখে কালো পট্টি বেঁধে শোয়। কেউ বা কালো কাপড়ে দরজা-জালনা ঢেকে রাখে।

রাসমুসের দেওয়া ঠিকানায় এসে মনে যে ভাবখানা এল তা কতকটা গুপী গায়েন, বাঘা বায়েন সিনেমায় হাতে চাপড় মেরে মুহূর্তমধ্যে গুপী-বাঘার গ্রাম থেকে একেবারে ধূ ধূ বালুর ঊষর প্রান্তরে হাজির হওয়ার মতন। কোথায় গেল সিটি সেণ্টারের সেই জমজমে ভাব! সামনে দিয়ে সোজা চলে গেছে হাইওয়ে। তার ওপাড়ে রুখু ঝোপঝাড়। শূন্য প্রান্তর। তারপর রেলওয়ে ট্র্যাক। দূরে ব্রিজ। আশেপাশে না একটা দোকান, না বাজার, না বাস- স্টপ। বাড়িগুলোরই বা কি ছিরি! সারি সারি বাড়ি মেটাল স্ট্যাণ্ডের বীমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন পুলিশি বেস ক্যাম্পের মতন।

ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট মেখে আবার প্রতীক্ষা। পাঁচ মিনিটের রাস্তা বলে এতক্ষণ লাগে? লাঞ্চটাইম পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আজ তিনজনেই হরিমটর খেয়েছি। ‘ব্যটাচ্ছেলে, আসুক না একবার,’ গজগজ করতে করতে পায়াচারি করে কর্তা। যতবার ফোন করার চেষ্টা করছি, ফোন বিজি যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)